একাত্তরের রজনী

যুথিকা বড়ুয়া

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন কি ভয়াবহ, অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তখন আমাদের পরাধীন মাতৃভূমি বাংলাদেশের। গ্রামে-গঞ্জে শহরে চতুর্দিকে গনহত্যা, লুণ্ঠন, মা-বোনের সম্ভ্রমহানী, ধর্ষণ, যা আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কম-বেশী অবগত আছি। যখন প্রাণের দায়ে সাধারণ জনগণ নিজের মাতৃভূমি এবং পৈত্রিক বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করে বেছে নিয়েছিল পলায়নের পথ। সেই সময় এক হতভাগ্য দরিদ্র কৃষকের পাঁচ বছরের শিশুপুত্র মুক্তিযুদ্ধের রণক্ষেত্রে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা যায়।

ধরে নেওয়া যাক, তার নাম কেষ্টচরণ। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মজদূর, খেটে খাওয়া মানুষ। সংসারে স্বচ্ছলতা ছিলনা কিন্তু দুঃখ-দৈনতা তাকে কখনো ঘায়েল করতে পারেনি! তার ছিল অসাধারণ আত্মবিশ্বাস এবং মনোবল। বাপ-ঠাকুরদার আমলের স্বল্পায়তনে জমিতে আনাচপাতীর চাষ করতেন। থাকতেন খড়-খুটোর ছাউনি দেওয়া একটি ছোট্ট মাটির ঘরে। যেখানে রাজ্যের কীট-পতঙ্গ, কেঁচো, সাপ-ব্যাঙ কিলবিল করতো। প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চূড়ান্ত অবণতি ঘটলেও তাকে কখনো বিভ্রান্ত করতে পারেনি। কিন্তু রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে একমাত্র শিশু পুত্রকে চিরতরে হারিয়ে দিশাহীন হয়ে পড়েন শোকাতুর কেষ্টচরণ। যেদিন তার পৈত্রিক ভিটেবাড়ি সহ চাষের জমি পরিত্যাগ করতে তাকে এতটুকু দহন করেনি, পীড়া দেয়নি। বাস্তবের রূঢ়তা, সংকীর্ণতা, অমানবতা এবং হীনমন্যতার ক্ষোভে দুঃখে, শোকে স্ত্রী ও এগারো বছরের কিশোরী কন্যা রজনীর লাজ বাঁচাতে বেরিয়ে পড়েছিলেন বসতবাড়ি ছেড়ে। পুত্রশোক বুকে চেপে আঁতঙ্কে রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে চুপিচুপি গভীর বন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রাতারাতিই যশোর হয়ে এসে পৌঁছায় বেনাপোল সীমান্তে। সেখান থেকে দিনের শেষে দিগন্তের কোলে আঁধার ঢলে পড়লে পূনরায় শুরু করেন তার যাত্রাভিযান। সীমান্তের কর্দমাক্ত এবং কন্টকময় দুর্গমপথ পেরিয়ে ঊষার প্রথম সূর্য্যের আলোয় বনগাঁও হয়ে সরাসরি গিয়ে আশ্রয় নিলেন, পশ্চিমবঙ্গের বারাসাতের রিফিউজি ক্যাম্পে। কি নোংরা, দুর্গন্ধ তাদের গায়ের জামাকাপড়! আপাদমস্তক রাস্তার ধূলোবালি। রুক্ষশুক্ষ এলোকেশ। অবিশ্রান্ত পদযাত্রায় আর বিনিদ্র রজনী পোহায়ে ক্ষিদায় তৃষ্ণায় দেখতে লাগছিল ভিখারীর মতো। মনে হচ্ছিল, মাটির তলদেশ থেকে বেরিয়ে এসেছে।

অগত্যা, করণীয় কিছু নেই। সময়ের নিমর্মতা কাঁধে নিয়ে শুরু করলেন নতুন জীবনধারা। বদলে যায়, প্রাত্যাহিক জীবনের কর্মসূচী। অচেনা অজানা জায়গা। নিত্য নতুন অপরিচিত মানুষের আগমন। ভিন্ন মনোবৃত্তি। অনিয়ম বিশৃংঙ্খল পরিবেশ। যেখানকার পারিপার্শ্বিকতার সাথে খাপ খাইয়ে চলা তাদের পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুস্কর। পদে পদে অপদস্থ। ভাগ্যবিড়ম্বনা। নিয়তি যাদের প্রতিনিয়ত পরিহাস করে, উপহাস করে, দুঃখ-দীনতা কখনো যার পিছুই ছাড়ে না, সে মানুষ সুস্থ্যভাবে বেঁচে থাকেই বা কেমন করে!

একদিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রিফিউজি ক্যাম্পেই মহাপ্রয়াণ ঘটে কেষ্টচরণের। আর দুঃখের দহনে করুণ রোদনে জীবনপাত করতে রেখে যান, স্ত্রী সুধারানী ও কন্যা রজনীকে! তখন ওর একেবারে কচি বয়স! বাড়ন্ত শরীর। অপূর্ণ বয়সেই বাঁধ ভাঙ্গা যৌবনের ঢেউ যেন উপছে পড়তে লাগল ওর শরীরে। আর ঐ যৌবনই ছিল রজনীর কালনাগিনী, বিপদ অবশ্যম্ভাবী! যা ও' নিজেও জানতো না। প্রতিনিয়ত

ক্ষুধার্ত হায়নার মতো লোভাতুর কামপ্রিয় পুরুষেরা ওকে ধাওয়া করতো। যখন ভোগের লালসায় নারী দেহের গন্ধে একজন ভোগ-বিলাসী পুরুষের মনবৃত্তিকে কলুষিত করে। অপবিত্র করে। অবমাননা করে নিজেকে। আর তারই অপকর্মের বীজ রোপণে দূষীত হয় আমাদের সমাজ। যখন বাধ্যতামূলকভাবে নীরিহ, অসহায়, যুবতী মেয়েরা ছদ্মবেশী প্রতারকদের প্রলোভনে বশ্যতার স্বীকার হয়ে পতিত হয়, অনিশ্চিত জীবনের নিরাপত্তাহীন এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার গুহায়। যা আইনত অপরাধ এবং দন্ডনীয়।

কিন্তু এসব গ্রাহ্য করছে কে! এ তো মনুষ্য চরিত্রের আবহমানকালের চিরাচরিত একটি প্রধান বৈশিষ্ঠও বলা যায়। বিশেষ করে যাদের অন্তরে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধটুকুই থাকেনা। রুচীবোধ থাকেনা। যারা পাপ-পূন্যের ধার ধারেনা। মান-মর্যাদার তোয়াক্কা করেনা। যার অভাবে মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার পরিবর্তে বন্যপশুর মতো অমানবিক আচরণে লিপ্ত হয়ে হরণ করে বসে তারা নিজেরাই।

রজনী, এক অঁজপাড়া গাঁয়ের অত্যন্ত সহজ সরল নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে। বয়সের তুলনায় বিবেক-বুদ্ধি একেবারে ছিল না বললেই চলে। মানুষজন দেখলে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকতো। মুচকি হাসতো। অথচ ওর শরীরের গড়ন আর চমকপ্রদ যৌবনের মুগ্ধ আর্কষণে ভ্রমরের মতো মধু শোষণ করতে উড়ে এসে গেঁড়ে বসতে চেয়েছিল, রিফিউজি ক্যাম্পেরই স্বেচ্ছাসেবক নামধারী এক তরুণ যুবক। যেদিন বিপন্ন সময়ের শিকার হয়ে রাতারাতি রিফিউজি ক্যাম্প ছেড়ে শহরের অন্যত্রে গা ঢাকা দিয়ে রজনীকে রক্ষা করেছিলেন ওর গর্ভধারিনী মা, শ্রীমতী সুধারানী।

কিন্তু দুর্ভাগ্য,তখন ওরা সভ্যসমাজে বাস করবার উপযুক্ত ছিলনা। ভাষা জানতো না। ব্যবহার জানতো না। শুদ্ধ বাংলা বলতে পারতো না। কাপড়-চোপড়ও ঠিক মতো পড়তে জানতো না। থাকতো গুদাম ঘরের মতো স্যাঁতসেতে জায়গায়। যে বাড়িতে মা-মেয়ে দুজনে ঝি-কাজ করতো। দুবেলা এঁটো বাসন মাজতো। মশলা বেটে দিতো। জামা-কাপড় কেঁচে দিতো। অবসরে কাগজের ঠোঙ্গা বানাতো। তাতে ক'পয়সা আর উপার্জন হতো! ঘর ভাড়া দিয়ে দুবেলা অন্নও জুটতো না পেট ভরে! শুধু আশ্রয়টুকুই ছিল একমাত্র নিরাপদ।

কাঁধে কলস নিয়ে টাইমকলের জল ভরতে গেলে রজনী একহাত ঘোমটা টেনে বের হতো। আর সেটা পাড়ার ছেলেদের জন্য ছিল, হাসির খোড়াক। ব্যঙ্গ করে বলতো, -'লজ্জাবতী ময়না, কথা কভু কয়না! মন যে কারো সয়না!'

ওরা যে পরিহাস করতো, রঙ্গ-তামাশা করতো, সেটাই মগজে ঢুকতো না রজনীর। উল্টে মজা পেতো! হন্‌হন্ করে কিছুদূর গিয়ে ঘোমটার আড়ালে মুখ টিপে হাসতো। অথচ বাইরের পৃথিবীর চোখ ধাঁধানো রূপ-রং যখন চোখে লাগল, পৃথিবীকে যখন জানতে শিখলো, বুঝতে শিখলো, মানবাধিকারের দাবিতে মনুষ্যত্বের দাঁড়িপাল্লায় জীবনের যখন মূল্যায়ন করতে শিখলো, রজনী তখন একুশ বছরের পূর্ণ যুবতী! ক্রমান্বয়ে দুর্বিসহ জীবনের একটা সুরাহা খুঁজে পাবার আশায়, নিজের জ্ঞান-বুদ্ধিকে বর্দ্ধিত করার এক অভিনব ইচ্ছা-আশা-আকাঙ্ক্ষায় ওকে ক্রমশ উৎসুক্য করে তোলে।
কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের গ্লানি ঝেড়ে ফেলে সদ্য প্রস্ফূটিত ফুলের মতো রূপে, গুণে কখন যে চাঙ্গা হয়ে উঠল, নিজেকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তুললো, পাড়া-পর্শী কেউ জানল না। বিস্ময়ে সবাই অভিভূত। যারা ওকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতো। অবজ্ঞা করতো। যেন এক অজ্ঞাত কূলশীল ভদ্রমহিলা।

পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের রচিত বই "বাল্যশিক্ষা" সকাল সন্ধ্যে দুইবেলা মন্ত্রপাঠের মতো গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করে যতটুকু বিদ্যা অর্জন করেছিল, তাতে শুধু বেশভূষাই নয়, ভাষা, ব্যবহার, চালচলন, কথা বলার ঢং এমনভাবে রপ্ত করে নিলো, সামাজিক রীতি-নীতির কিছু বৈষম্যতা এবং প্রতিকূলতার মধ্যেও বেমালুম বদলে গেল রজনী। যেদিন ওর সমগ্র অস্থি-মজ্জা এবং হৃদয়ের কোণে ঘুমিয়ে থাকা চমকপ্রদ প্রতিভার দক্ষতায় অনায়াসে হাসিল করে নিয়েছিল, সভ্যসমাজে বসবাস করবার পূর্ণ অধিকার। যেদিন খুঁজে পেয়েছিল, নিজের অস্তিত্ব, মনুষ্যত্ব, বেঁচে থাকার মূল অর্থ! যেদিন ওর চোখের আলোয় দেখতে পেয়েছিল, অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের একফালি খুশীর ঝলক। আর সেই দিনই রজনীর জাগ্রত হয়, প্রখর সংগ্রামী মনোভাব। মানবিক চেতনা।

দিগ্বিবিজয়ের মশাল নিয়ে রজনী বেরিয়ে এলো চার দেওয়ালের বদ্ধজীবন থেকে। বেমালুম ভুলে গেল, ওর অতীতের ভাগ্যবিড়ম্বনায় চরম দারিদ্রপীড়িত গ্রাম্য জীবনের দুঃখ দীনতার দিনগুলিকে! ভুলে গেল, শৈশব ও কৈশোরের স্মৃতিবিজড়িত নিজের মাতৃভূমিকে! ভুলে গেল, পৃথিবীর মানচিত্রে অন্তর্ভূক্ত স্বাধীন বাংলাদেশকে! যার সম্মুখে ছিল, এক সুদূর প্রসারী সম্ভাবনার স্বপ্ন ও আশাতীত সফলতা। ক্রমে ক্রমে যে দেশটি ধনধান্যে পুস্পে ভরে উঠেছিল। গড়ে উঠেছিল, সুখ-সমৃদ্ধশালী এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে।

তা হোক, তবু স্বদেশে আর ফিরে যাবেনা রজনী। মাতৃভূমি কখনো আর স্পর্শ করবে না। সেখানে ওর আছেইবা কে? ছিল তো একমাত্র ছোটভাই বিভাষ, ওকে কি ফিরে পাবে কোনদিন? পারবে কেউ ওকে ফিরিয়ে দিতে?
চেয়েছিল, নিজের সততায়, কর্ম দক্ষতায় সাবলম্বী হতে, নিজস্ব মাটিতে শক্তপায়ে দাঁড়াতে। সুশীল সমাজে অবস্থানকারী আর পাঁচজনের মতো পূর্ণ মান-মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। মায়ের দুঃখ চিরতরে মুছে দিতে।

কিন্তু বিধির বামে তা আর বাস্তবায়ীত হয়নি! রজনী পারেনি, জীবনকে ইচ্ছেমতো নতুন রূপে, নতুন রঙে সাজাতে। পারেনি, নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করতে। ওর একান্ত মনবাসনাগুলিকে যথাযথ পূরণ করতে। অবলীলায় মায়ের একান্ত ইচ্ছায় ও পীড়াপীড়িতে ওকে স্বদেশেই ফিরে যেতে হয়েছিল। ভেবেছিল, ফেলে আসা দেশের স্বল্পবিস্তর জমিটুকু নিশ্চয়ই ফিরে পাবে। ফিরে পাবে নিজের মাতৃভূমি। যেখানে শেষ করেছিল, সেখান থেকেই শুরু হবে ওদের পূণর্জীবন।

কিন্তু সদ্য প্রতিষ্ঠিত সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবন ছেড়ে কোন্ কুক্ষণে যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল, তার পর দিন ঊষার প্রথম আলো উদ্ভাসিত হবার পূর্বেই নিভে গেল রজনীর অনাগত ভবিষ্যৎ জীবনের উজ্জ্বল আলোর রশ্মি।

নতুন জীবনের আনন্দ-বেদনার অভিজ্ঞতা সাথে নিয়েই যাত্রা শুরু করেছিল, একটি নতুন দিনের, নতুন সূর্য্যের আলো আশায়। স্বদেশের শষ্য-শ্যামল গাঁয়ের সবুজ বনভূমি আর ধানভাঙ্গার স্বপ্ন দেখতে দেখতে কখন যে মধ্যরাত পেরিয়ে গিয়েছিল, টেরই পায়নি। সীমান্তের কাছাকাছি পৌঁছাতেই একটি চায়ের দোকানের পাশে ওদের যাত্রীবাহী বাসটি হঠাৎ বিনা নোটিশে থেমে যায়। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। শূন্য, নির্জন পরিবেশ। রাস্তার আলোও প্রায় নিভু নিভু। স্পষ্ট দেখাই যাচ্ছিল না কিছু! মাঝে মধ্যে দু-একটা গাড়ি দ্রুত গতীতে পাস করে যাচ্ছিল। সেই সময় কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে সুধারানীও নেমে পড়েছিল গাড়ি থেকে। গিয়েছিল কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসতে। যখন দুষ্টচক্রের শিকার হয়ে

চিরদিনের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মা-মেয়ে দুজনেই! যা স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি সুধারানী। এ যেন তীরে এসে তড়ী ডোবার মতো অবস্থা।

মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধান! ফিরে এসে দ্যাখে, রজনী গাড়িতে নেই! ওর হ্যান্ডব্যাগটা সীটের মধ্যে পড়ে আছে। শীঘ্র ব্যাগটা খুলে দেখল, একখানা কাগজের টুকরো। তাতে লেখা ছিল, 'ছোড়ির তালাশ করবি, খালাশ করে দেবো!'

ততক্ষণে সর্বণাশের কিছুই আর অবশিষ্ঠ নেই রজনীর! সব শেষ! অথচ কত স্বপ্ন, কত আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে বেঁধে ফিরে যাচ্ছিল স্বদেশে। কিন্তু অদৃষ্টের কি লিখন ওর!

ভয়ে-আতঙ্কে গলা শুকিয়ে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল সুধারানীর। চিৎকার করবে, লোকজন জড়ো করবে, সে ক্ষমতাও তখন তার ছিলনা। থর্‌থর্‌ করে কাঁপছিল। জমে হীম হয়ে আসছিল সারাশরীর। কিন্তু কি শান্তনা দেবে সে নিজেকে? কি কৈফেয়ৎ দেবে সে এখন নিজেকে? রজনী তো আসতেই চাইছিল না! ওর ইচ্ছাকে অগ্রাহ্য করে, ওর মরা বাপের দিব্যি দিয়ে, ওকে জবরদস্তী ফিরিয়ে নিয়ে আসছিল দেশে। ওযে নিজের মতো করে বাঁচতে চেয়েছিল! জীবনকে উপভোগ করতে চেয়েছিল। এ কি সর্বণাশ করল সে রজনীর? ওকে আর কি ফিরে পাবে কোনদিন? চোখের দেখাও কি আর দেখতে পাবে কোনদিন? ওই তো ছিল জীবনের একমাত্র সম্বল! বেঁচে থাকার শক্তি। সুধারানী বাঁচবে কাকে নিয়ে? বেঁচে থাকবে কি নিয়ে?

কিন্তু জলজ্যান্ত একটা যুবতী মেয়ে মন্ত্রের মতো রাতারাতি গাড়ি থেকে উধাও হয়ে গেল কোথায়? কে নিয়ে গেল ওকে? কারা নিয়ে গেল? কোথায় নিয়ে গেল? কেন নিয়ে গেল? কিন্তু এসব প্রশ্নের জবাব দেবে কে! এ যে ধূর্ত, দুষ্ট লোকের চক্রান্ত, তা বুঝতে একটুও দেরী হলো না সুধারানীর। কিন্তু সে যে বড় অসহায়, আশ্রয়হীন, সম্বলহীন, উদ্দেশ্যহীন পথের যাত্রী। অবিরাম পদযাত্রায় যখন যেখানে থমকে দাঁড়ায়, সেটাই তার ক্ষণিকের আশ্রয়, ঠিকানা। যার পৃথিবীতে আর কেউ নেই!

পরবর্তীতে গোয়েন্দা বিভাগের দপ্তর থেকে আনুমানিকভাবে জানা গিয়েছে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থেই বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে সীমান্তের গুপ্তচরেরাই রজনীকে সঁপে দেয়, নারী পিপাসু অত্যাচারী পাষন্ডদের হাতে। কেউ বলে, 'আবর দেশের রাজা বাদশাদের হাতে।'
যেখানে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মাথাকূটে কেঁদে মরে গেলেও কেউ শুনবে না ওর আর্তনাদ, অনুনয় -বিনয়, আকুতি-মিনতি! যার কোনো খোঁজ-খবর আর পাওয়া যায়নি! রজনী জীবিত কি না, সে খবরও কেউ জানে না!

সমাপ্ত

যুথিকা বড়ুয়া : কানাডার টরন্টো প্রবাসী লেখিকা ও সঙ্গীত শিল্পী।
২২ শে মার্চ, ২০০৯,
guddi_2003@hotmail.com